11 NOV 1993

দৈনিক খবর

ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ—২

○ ডাঃ এস এ মালেক ○

ছাত্র রাজনীতি এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের সাথে ছাত্র রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা। স্বৈরশাসকরাই সর্বপ্রথম শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটায়। রাজনৈতিক কারণে ছাত্রদের ব্যবহার করবার জন্যে তারা ছাত্রদের হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দেয়। তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বও দেয়া হয়েছিল। আইয়ুব–মোনায়েম আমলেই এ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাসবাদ ছাত্র রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। এমনকি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও সরকার ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসবাদমুক্ত করতে পারেননি বরং নিজেরাই সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়েছেন।

সন্ত্রাসবাদ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ প্রায় ধ্বংসের পথে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসবাদকে অপসারিত করতে না পারলে আগামী প্রজন্ম সত্যিকার অর্থে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সাহচর্য পাবে বলে মনে হয় না। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে তাতে কয়েক দশক পরে এ দেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ও শিক্ষক বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। জাতীয় পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানই আমরা নিজেরা পরিচালিত করতে সক্ষম হব না। রাস্তাঘাট, স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, কল–কারখানা, হাসপাতাল, উন্নয়ন তৎপরতা এমনকি প্রশাসন পরিচালনার জন্যেও বিদেশ থেকে লোক ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তবে তা সমগ্র জাতির জন্যে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

এসব চিন্তা–ভাবনা করে আজ সচেতন মহল শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে আগ্রহী বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারে পত্র–পত্রিকায় ও সভা–সমিতিতে যে সব মতামত ব্যক্ত হচ্ছে তার স্বচ্ছতা নিয়েই অনেক প্রশ্ন আছে। এসব মতামত এতই পরস্পরবিরোধী যে, এর ওপর ভিত্তি করে জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য বলে মনে হয় না। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, রাজনীতিবিদরা কি ভাবছেন বিশেষ করে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলসমূহ, যাদের ছাত্র সংগঠন দেশব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত আছে তাদের মতামতই বা কি?

এ দেশের রাজনৈতিক দলের জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, তাদের অনেকাংশেই রাজনৈতিক ব্যাপারে ছাত্রদের ওপর নির্ভরশীল তথা জনসংখ্যার অধিকাংশই অশিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হওয়ায় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা খুবই কম। একমাত্র জনসভায় উপস্থিত হওয়া ও নির্বাচনকালে ভোট দেয়া ছাড়া তারা আর বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন বলে মনে হয় না। এমনকি নির্বাচনকালেও জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ লোকই ভোট দিতে চান না। জনসভার উপস্থিতিও জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম। তাই সচেতন ছাত্র সমাজ এখানে জাতীয় রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে অতীতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন ভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২–এর শিক্ষা কমিশনের আন্দোলন, '৬৬–এর ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন, '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০–এর নির্বাচন ও '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। জনগণের সার্বিক স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে তাদের অসামান্য অবদানের কথা আজও জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে। ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি''– এ ধরনের শোক সঙ্গীত আজ বাঙ্গালীর ধমনীতে শিহরণ জাগায়, লাখ মানুষ নগ্ন পায়ে শোক মিছিলে শরীক হয়ে শ্রদ্ধা জানায় অমর শহীদদের প্রতি। আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ছাত্র ভাইদের নিয়ে রচিত হয়েছে অগণিত শোক সঙ্গীত, কবিতা, ন্যাটক ও উন্নতমানের সাহিত্য। আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবার কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ছাত্র রাজনীতির এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য পরবর্তীতে অম্লান রাখা সম্ভব হয়নি। ক্ষমতাকালীন দায়িত্বহীন শাসকরা তাদের ক্ষমতার ভিতকে মজবুত করবার লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন নিঃসন্দেহে। তাই দেখা যায়, ষাট দশকে একদিকে যেমন ছাত্র সমাজ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আবার অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ছাত্র নামধারী দালালরা সরকারী প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র হয়ে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় লিপ্ত। রাজনৈতিক কারণে ছাত্ররাই তাদের সহপাঠীদের রক্ত ঝরাতে উদ্যত। প্রতিহিংসাপরায়ণতার বিষবাষ্পে শিক্ষাঙ্গন বিষাক্ত। স্বৈরশাসকরা সাধারণ মানুষের ভিতর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র সমাজকে তাদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সামরিক গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তারা ছাত্র সমাজের একাংশকে গোয়েন্দা বাহিনীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য করে। এরাই সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের মূল হোতা। অর্থ ও অস্ত্র যোগান দিয়ে তাদের দিয়েই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালনা করা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল স্বৈরশাসকদের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন অবদমিত করা। শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও ভাড়াটিয়া ছাত্রদের দিয়ে স্বৈরশাসকরা তাদের রাজনীতির সমর্থনে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাতে দ্বিধাবোধ করেনি। বিরোধী দলের জনসভায় হামলা করা, মিটিং–মিছিল ভঙ্গ করা, ধর্মঘটের সময় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, নির্বাচন পর্বে জোর–জবরদস্তিমূলকভাবে ভোটের বাক্স ছিনতাই করা অথবা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেয়া– এ সব কিছুই সরকারী ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে করা হয়েছে। বিনিময়ে তাদের সরবরাহ করা হয়েছে বিপুল অর্থ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্ব এবং আরও অনেক কিছু। গোয়েন্দা বিভাগ নিয়ন্ত্রিত ঐ সব তথাকথিত ছাত্র নেতার জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল একটা ক্ষুদে জমিদারের মত। শিক্ষাঙ্গনে অবস্থান করেই তারা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেত, নরহত্যার আসামী হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা কঠিন ছিল। প্রশাসন ও পুলিশ তাদের সমীহ করে চলত। এসব ছাত্রনেতা গভীর রাতে গোয়েন্দা বিভাগের সাথে দেন–দরবার ও সলাপরামর্শ করতো এবং দিনের বেলায় স্বৈরশাসকদের হয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চালাত। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করবার এদের কোন আগ্রহ ছিল না। বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার লক্ষ্যে তারা বার বার বিভিন্ন অনুষদে ভর্তি হয়ে শিক্ষাঙ্গনে তাদের অবস্থানকে প্রলম্বিত করত, শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করত, অরাজকতার পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। মুক্তিযুদ্ধ– উত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে ছাত্ররা বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশ পুনর্গঠনের কাজে তৎকালীন ছাত্র তৎকালীন ছাত্র সমাজকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। পুনর্গঠনের কাজে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধের কারণে অস্ত্র হাতে পেয়ে ছাত্র সমাজের একাংশ সন্ত্রাসবাদের পথে ধাবিত হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চমকপ্রদ শ্লোগান দিয়ে তৎকালীন ছাত্র সমাজের একাংশ শ্রেণী সংগ্রামের নামে প্রকারান্তরে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। তার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সেদিনের সেই হঠকারিতার কারণেই প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতীয় স্বাধীনতাকে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

গোটা ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে যদি স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পুনর্গঠন কাজে নিয়োজিত করা যেত তবে দেশ আজ এই গভীর সংকটে নিমজ্জিত হত না। এটা একটা জাতীয় পর্যায়ের চরম ব্যর্থতা যা আমরা সফলতার সাথে করতে পারিনি। এ ব্যাপারে ভুল–ভ্রান্তির উর্ধ্বে আমরা কেউই নেই।

জেঃ জিয়া ও জেঃ এরশাদের আমলে সরকারী ছাত্র সংগঠন দিয়ে যা করা হয়েছে দেশবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই আমল ছিল স্বৈরশাসকের তোষামোদের আমল। দালালীর ভাষায় কথা বলে, স্বৈরশাসকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে নেয়া ছাড়া তৎকালীন সরকারী ছাত্র সংগঠন আর কিছু করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। পনের বছর স্বৈরশাসককে স্থায়ী করবার ব্যাপারে দালাল ছাত্র সংগঠনসমূহের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল– তাতে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা গৌরবময় হলেও দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তারা উঠতে পারেনি। যে কারণে একটা দল ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই ছাত্র ঐক্য বিনষ্ট করে সরকারী ছাত্রদল একচ্ছত্রভাবে দলীয় সরকারকে সমর্থন করে চলেছে। যদিও ক্ষমতাসীন দল বিগত আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সমাজের অঙ্গীকার পূরণ করতে এগিয়ে আসেনি। বরং সম্পূর্ণ বিপরীতে একটা অবস্থান গ্রহণ করেছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জেঃ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তারপর ঐক্যের পিঠে পদাঘাত করে সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দলীয় সরকারের গণবিরোধী তৎপরতাকে সমর্থন করে চলেছে। জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে তারা দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখেছে।

ঠিক স্বৈরশাসনামলের সন্ত্রাসবাদকে তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের আমলেও প্রায় একইভাবে অব্যাহত রেখেছে বা ক্ষেত্র বিশেষে ছাড়িয়ে গেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ঠিক স্বৈরশাসকের মত সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করতে চাইছেন ও ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসবাদকে নিরন্তর প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। ছাত্রদের জাতীয় দাবী হতে সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলকে আলাদা করে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার ভিতকে মজবুত করবার কাজে যেভাবে সরকারী দল ব্যবহার করছে তাতে ছাত্র সংগঠন হিসেবে তাদের আর কোন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল এখন শুধুমাত্র বিরোধীদের সাথেই সন্ত্রাস করে না, নিজেদের নিজেদের ভিতরও সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিত্ত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা বিভক্ত হয়ে, একে অপরকে আক্রমণ করছে, হত্যা করছে। সর্বশেষ উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড, যাতে ছাত্রদলেরই এক নেতা কর্মকর্তা তার দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে নিহত হয়েছেন। শোনা যায় যে, মন্ত্রীরা তাদের দপ্তরে ছাত্রনেতাদের তদবিরের কারণে কাজকর্ম করতে পারছেন না। সরকারী কর্মচারীরা, অফিস–আদালতে এদের দ্বারা অবৈধভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। চাকরি, ব্যবসা–বাণিজ্য, সমাজের ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ সরকারী ছাত্র সংগঠন হস্তক্ষেপ করছে এবং সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে দিচ্ছে না। তাদের এসব অবৈধ কাজে প্রশাসন মদদ যোগাচ্ছে। ছাত্রদলের কর্মীরা সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হলেও তাদের বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা পর্যন্ত গ্রহণ করা হচ্ছে না। অথচ বিরোধী দলের ছাত্রদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হাজতে পাঠান হচ্ছে ও শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সরকারী দলের সমর্থক না হলে ভর্তি হওয়া, আবাসিক হলে সিট পাওয়া ও নিয়মিত সুযোগ–সুবিধা ভোগ করে শিক্ষা জীবন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারী ছাত্র সংগঠন আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্তা। তাদের হুকুমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। দুর্নীতি ও অনিয়মতান্ত্রিকতা আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন পদ্ধতিকে সার্বিকভাবে ব্যাহত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত আজ একই হস্তক্ষেপের শিকার হচ্ছেন। অথচ সরকার সবকিছু জেনে–শুনেও ছাত্রদলের সন্ত্রাসী তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না বা করছেননা।

কোথায় কোথাও সরকারী প্রশাসনের পাশাপাশি ছাত্রদল সমান্তরাল প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আজ ছাত্রদলের কারণে ব্যাহত হচ্ছে। নিয়মিত ঠিকাদারদের কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, টেন্ডার দিতে না দেয়া এমনকি তাদের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্রসমূহ ছিনিয়ে নেয়া, তাদের কাছ থেকে নগদ টাকা কেড়ে নেয়ার মত ঘটনা ঢাকা মহানগরীর ওপরই ঘটছে অহরহ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জোরপূর্বক চেক সই করিয়ে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষকদের অপদস্থ হতে হয়েছে।

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ দলীয় অবৈধ তৎপরতায় শিক্ষকদের সমর্থন না পেলে, তাদের শুধু লাঠিপেটাই করেনি, মিথ্যা মামলা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং এ কারণে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আইনকে তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেয়ার দাবীতে ধর্মঘট করতে হয়েছে, প্রতীকী অনশন করতে হয়েছে। এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের এখনও অবসান হয়নি। অথচ সরকার এ ব্যাপারে মোটেই সংকোচবোধ করছেন না। শোনা যায়, মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্য ছাত্রদের ইন্ধনযোগাচ্ছেন।

মন্ত্রীরা আজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের বিভক্ত করে জেলায় জেলায় সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছেন। যার শিকার হচ্ছে সাধারণ ছাত্র ও নাগরিকবৃন্দ।